নিধুবাবুর গানের উৎস : কয়েকটি উপাদান

নিধুবাবুর জীবনে একটি নারীর সঙ্গে বিচিত্র সংযোগ ঘটেছিল। এই নারী মুর্শিদাবাদের এক রাজার রক্ষিতা, নাম শ্রীমতী। এই সংযোগের একটি গুরুত্ব আছে। কেননা, নিধুবাবুর অনেক গানের মূলে ছিল শ্রীমতীর প্রেরণা। নিধুবাবু যে সময়ের লোক তখন বাবুদের সঙ্গে বারাঙ্গনাদের সংযোগ ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এই নিয়ে মারামারি কাটাকাটিও ছিল নৈত্যনৈমিত্তিক ঘটনা; কিন্তু যেটা সে যুগের পক্ষে অস্বাভাবিক সেটা হচ্ছে এই যে, শ্রীমতী গণিকা হয়েও নিধুবাবুকে সংগীত রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং তাঁদের সম্পর্ক নেহাত স্বার্থবোধকে কেন্দ্র করে রচিত হয় নি। এই সম্বন্ধ প্রণয়ের কি সহজ বন্ধুত্বের সে নিয়ে কিছু আলোচনা যে হয় নি তা নয়। নিধুবাবুর প্রথম জীবনী-লেখক ঈশ্বর গুপ্ত এই সম্পর্ককে প্রণয়ের সম্পর্ক বলে স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে—'তিনি লম্পট ছিলেন না, কেবল স্তুতি, বিনয়, স্নেহ এবং নির্মল প্রণয়ের বশ্য ছিলেন। এই প্রযুক্ত তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং কিয়ৎক্ষণ হাস্য-পরিহাস কাব্য আলাপ ও গীতবাদ্য করিয়া আসিতেন। আর সেখানে বসিয়া মনের মধ্যে যখন যেমন ভাবের উদয় হইত তৎক্ষণাৎ তাহারই এক-এক গীত রচনা করিতেন।' আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যেও কেউ কেউ এই মত সমর্থন করেন। কিন্তু জনশ্রুতি এবং একাধিক গ্রন্থ অনুসারে এ সম্পর্ক ছিল একান্ত প্রণয়ের সম্পর্ক। এ-সব গ্রন্থে এমন অনেক গান উদ্ধৃত হয়েছে যা নিধুবাবুর রচনা বলেই চলে আসছে এবং প্রবাদ অনুসারে এ গানগুলির সঙ্গে শ্রীমতীর সংযোগও রয়েছে। এই জনশ্রুতিকেও উড়িয়ে দেওয়া শক্ত। যাঁরা এই গানগুলি নিধুবাবুর রচনা বলে স্বীকার করেন না তাঁরাও এগুলির রচয়িতা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারেন নি। অনেক গান 'প্রীতিগীতি'-নামক গীত-সংকলনে রয়েছে, কিন্তু রচয়িতার কোনো নির্দেশ নেই। বহু গানের পরিচয় 'বাঙ্গালীর গান'-এর মতো বৃহৎ গীত-সংগ্রহেও মেলে না। আমার সংগ্রহে 'প্রেমসঙ্গীত—নিধুবাবুর জীবনী সংগীত ও সমালোচনা একত্রে' (১২৯৪)-নামক একটি

বই আছে, তাতেও শ্রীমতীকে উপলক্ষ করে অনেক গানের উল্লেখ আছে। বইখানির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশি নয়, কিন্তু নিধুবাবুর নামে প্রচলিত গানগুলি চিন্তার উদ্রেক করে। এমন অনেক শিল্পী এখনো বেঁচে আছেন যাঁরা এই-সব গানের মধ্যে যেগুলি তাঁদের পরিচিত সেগুলি নিধুবাবুর বলেই জানেন। এইরকম কয়েকটি জনশ্রুতিকে একত্র করে অমরেন্দ্রনাথ রায় ১৩২৩ সালে 'নারায়ণ' নামক মাসিক পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় 'নিধু গুপ্ত'-নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু এই প্রবন্ধ গবেষকদের মনে তেমন চিন্তার উদ্রেক করে নি। একজন পণ্ডিতব্যক্তি এই-সব জনশ্রুতিকে বটতলার সস্তা প্রচার বলে অগ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু এতদিন ধরে যে-সব কাহিনী চলে আসছে তার মধ্যেও ভাববার কিছু আছে বৈকি? সব গান নিয়েই তো আর গল্পের সৃষ্টি হয়নি, কয়েকটি নিয়েই হয়েছে। সেই-সব গানের কাঠামো, ভাব, ভাষা—এইগুলি সব বিচার করে দেখা উচিত এবং যদি অপর কোনো গীতিকারের রচনায় এগুলি না পাওয়া যায় তা হলে প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত জনশ্রুতির উপর নির্ভর করতে হবে।

নিধুবাবুর সম্বন্ধে জনশ্রুতি রটবার আরো একটি কারণ আছে। সেটি হচ্ছে এই যে, নিধুবাবু সব সময়ে কাগজ কলম নিয়ে গান লিখতে বসতেন না, যে পরিবেশে গান তাঁর মনে আসত সেখানেই তিনি রচনা করে যেতেন। এই-সব আড্ডা থেকে অনেক গান মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত এবং কোন্ ঘটনায় সে-সব গান রচিত হয়েছে তা অনেক সময় প্রচারিত হত আবার অনেক সময় প্রচারিত হত না। এর ফলে নিধুবাবুর অনেক গান অপরের নামে চলতে লাগল। নিধুবাবু নিজে সেগুলি লিখে না রাখায় পরে আর সেগুলি তাঁর নিজের বলে দাবি করতে পারতেন না। অবশেষে অনেক ঠকে, শেষ বয়সে গানগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করে ছাপিয়েছিলেন। এই বই-এর নাম 'গীতরত্ন'।

শ্রীমতীর প্রসঙ্গে যে-সব গান রচিত হয়েছে তার কাহিনী বেশ চিত্তাকর্ষক। কয়েকটি বিবৃত করি :

মুর্শিদাবাদের মহারাজা মহানন্দ রায় নিধুবাবুকে খুব ভালোবাসতেন। একদিন তাঁর বাগানে নিধুবাবুর গানের বৈঠক বসল। এই বৈঠকে নিধুবাবুর গান শুনে শ্রীমতী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং ক্রমে এই আকর্ষণ নিবিড় আসক্তিতে পরিণত হল। এই সময় নিধুবাবু প্রতিদিন শ্রীমতীর কাছে আসতেন। একবার কোনো কারণে দিনকয়েক আসতে পারেন নি। তার পরে যখন দেখা হল শ্রীমতী বললেন—'অবলাকে এত প্রবঞ্চনা কেন? এটি তোমাদের পুরুষত্ব?' নিধুবাবু একটু হেসে গাইলেন—

ভৈরবী—মধ্যমান

কে বলে অবলা তোমায় মহাবল ধর প্রিয়ে,

ধরাধর ধর হৃদে ঢেকেছে বসন দিয়ে।
স্মরহর শর সম কটাক্ষ তব বিষম,
নিরুপমা নির্গুণ নরবধ নারী হয়ে।।

এই গানটি 'প্রেমসঙ্গীত' থেকে উদ্ধৃত করলাম। অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ও নারায়ণ পত্রিকায় অবিকল এই গানটিই ছেপেছেন। যে ভাষায় এটি আছে তাতে স্পষ্ট অর্থবোধ হয় না। প্রবীণ গীতশিল্পী শ্রীকালীপদ পাঠক এ গানটি খাম্বাজে গেয়ে থাকেন—তিনি আমাকে যে পাঠ দিয়েছেন সেটিই সংগত বোধ হয়। পাঠটি এই রকম—

কে বলে অবলা তোমায় কত বল ধর প্রিয়ে,
হৃদঞ্চলে ধরাধর ঢেকেছে অঞ্চল দিয়ে।
পঞ্চশর শরসম কটাক্ষ তব বিষম
নিরুপম পরাক্রম নরবধ নারী হয়ে।।

শোনা যায় এই গানটির সঙ্গেই নিধুবাবু নিম্নোদ্ধৃত গানটিও রচনা করেছিলেন। এ গানটি বর্তমানে কালী মীর্জার রচনা বলে স্বীকৃত :

এমন নয়নবাণ কে তোমার করেছে দান,
সর্পণে হেরিলে আঁখি আপনি হবে সন্ধান।
নয়ন অক্ষয় তূণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ
বিধি যদি দিত গুণ বধিতে অনেকের প্রাণ।।

বিবিধ সংগীত সংকলনে এ গানটির সুর 'সিন্ধু-ভৈরবী' বলে দেওয়া আছে। বর্তমানে প্রবীণ গায়কদের মুখে এটি বেহাগে গাইতে শুনেছি। অনেকে 'এমন নয়নবাণ'-এর স্থলে 'এমন কাম্যবাণ' এই কথা ব্যবহার করেন।

আর-এক বার অনেক দিন অদর্শনের পর নিধুবাবুকে দেখে শ্রীমতী অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন—'এতদিনে কি মনে হলো, তাই বুঝি দেখা দিতে এলে?' নিধুবাবু কথায় ও অভিমানের উত্তর না দিয়ে গান রচনা করলেন—

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে—
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
শ্রীমুখে (সুধামুখে) মধুর হাসি
আমি বড় ভালবাসি

এই গানটির যেমন বহু পাঠান্তর আছে তেমন সুরান্তরও আছে। ভৈরবী, সিন্ধু ভৈরবী ও যোগিয়া—এই তিনটি সুরের উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন গ্রন্থে। আজকাল এ গানটি খাম্বাজেই গাওয়া হয়ে থাকে এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছে শুনেছি তাঁরা বহুকাল থেকে

এ গানটি খাম্বাজেই শুনে আসছেন। গানটির নিম্নোদ্ধৃত পাঠই সাধারণত নিধুবাবুর নামে চলে আসছে :

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি দেখতে বড় ভালবাসি
তাই তোমায় দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে।।

এ গানটি বর্তমানে পণ্ডিতদের মতে শ্রীধর কথকের রচনা। শুধু এটি নয়, আরো কয়েকটি গান যা বহুকাল থেকে জনশ্রুতি অনুসারে নিধুবাবুর বলে পরিচিত সেগুলি কিছুকাল থেকে শ্রীধরের রচনা বলে ঘোষণা করা হচ্ছে। এর স্বপক্ষে কোনো জোরালো প্রমাণ আছে কি না জানি নে, তবে 'বাঙ্গালীর গান' (১৩১২) নামক গ্রন্থে শ্রীধরের জীবনকাহিনী আলোচনায় যে প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে সেটিই পণ্ডিতমণ্ডলী গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। এই অংশটি উদ্ধৃত করি—

'আমরা বহুদিন পূর্বে হুগলী জেলাস্থ প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম এ গান নিধুবাবুর নহে,—শ্রীধর কথকের যখন শ্রীধরের সমগ্র সংগীত উদ্ধার করিবার আমাদের আগ্রহ জন্মিল, তখন শ্রীধরের ভ্রাতুষ্পুত্র সুবিজ্ঞ কথক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুল্যচরণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের আমরা শরণাপন্ন হইলাম। আমরা শুনিয়াছিলাম, স্বয়ং শ্রীধর তদীয় সমগ্র গান একখানি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে খাতাখানি জীর্ণ এবং স্থানে স্থানে কীটদষ্ট। সেই খাতা উক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র অতুল্যের নিকট ছিল। শ্রীধরের স্বহস্তলিখিত সেইখানিতেই ঐ "ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে" গানটি লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু খাতায় লিখিত গানের সহিত প্রচলিত গানের পার্থক্য আছে। শ্রীধরের খাতায় লিখিত গানটি এইরূপ :

ভালবাসিবে বলে, ভালবাসিনে
আমার যে ভালবাসা তোমা বই জানিনে
বিধুমুখের মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি,
তাই, —আমি দেখিতে আসি—
দেখা দিতে আসিনে।।

এ থেকে এমন প্রমাণিত হয় না যে, গানটি শ্রীধরের রচনা। বরঞ্চ এটাই মনে হয় যে, শ্রীধর গানটির ভাষায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে ব্যবহার করেছেন। তা ছাড়া কলকাতায় শ্রীধরের যে বিশেষ পসার ছিল এমন প্রমাণ নেই। তিনি হুগলি-বাঁশবেড়ের লোক—মুর্শিদাবাদ, বহরমপুরেও কিছুকাল ছিলেন। এ গানটি কিন্তু কলকাতার গাইয়ে

মহলে বহুকাল থেকে নিধুবাবুর রচনা বলে চলে আসছে। শুধু শ্রীধরের খাতার প্রচলিত গানের একটা পাঠান্তর পাওয়া যায় বলেই শ্রীধরকে এ গানের রচয়িতা বলে স্বীকার করা যায় না। অবশ্য হুগলি জেলায় শ্রীধর নিজে এ গান গাইতেন বলে গানটি তাঁর নামেই প্রচারিত হয়েছে এবং শুনেছি শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত একটি পুরাতন গ্রন্থে এ গান শ্রীধরের নামেই ছাপানো হয়েছে।

এই রকম আর-একটি বিখ্যাত গান যা নিধুবাবুর নামের সঙ্গে বহুকাল থেকে যুক্ত অথচ শ্রীধরের রচনা বলেও প্রচারিত হয়েছে সেটি হচ্ছে—

নয়নের দোষ কেন

মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নের দোষ কেনে।
আঁখি কি জমাতে পারে না হ'লে মন মিলন
আঁখিতে যে যত হেরে সকলই কি মনে ধরে
মন যারে মনে করে সেই তার মনোরঞ্জন।

এই গানেরও কিছু পাঠান্তর এবং সুরান্তর আছে। এই গানের সঙ্গেও একটি কাহিনী চলে আসছে। একদিন নিধুবাবু গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছেন এমন সময় শুনলেন একটি যুবতী আর-একজনকে বলছে—'চোখই যত অনর্থের মূল, নয় ভাই?' কথাটা তাঁর মনে ঘা দিল এবং এই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই তিনি এই গানটি রচনা করেন। অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় নারায়ণ পত্রিকায় যে কাহিনী বিবৃত করেছেন তারও মূল বিষয় একই।

শ্রীমতীর অভিমান ভাঙবার জন্যও নিধুবাবু অনেক গান রচনা করেছেন বলে শোনা যায়। একবার কিছুকাল নিধুবাবুর দেখা না পাওয়ায় শ্রীমতী অভিমান করেছিলেন। ওঁকে তুষ্ট করবার জন্য নিধুবাবু গাইলেন—

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

অনুগত দোষী হলে তার দোষ নাহি লয়
মহতেরি এই রীতি আপন করিয়ে লয়।
দেখনা মলয় গিরি বেষ্টিত ভুজঙ্গে
গরল সরল হয় মহতেরি সঙ্গে
আপন কলঙ্ক ছাড়ি শশী কি উদয় হয়?

এ গান শুনে শ্রীমতী বললেন—'তা এখন তো দেখা পাবই না, যখন বয়স ছিল তখন নিতাই পেতাম, এখন—' নিধুবাবু আবার গানে উত্তর দিলেন—

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—মধ্যমান

না হ'লে রসিকে বয়োধিকে প্রেম জানে না,

যেমন ভুজঙ্গশিশু মন্ত্রৌষধি মানে না।
নবীনেরি অহঙ্কার প্রবীণেরি প্রেমাধার
এ রস রসিকে বিনা অরসিকে সম্ভবে না।।

এ গান শোনাবার পর শ্রীমতী অভিমান পরিত্যাগ করলেন।

শ্রীমতীর প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিধুবাবু তাঁর স্ত্রীর প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তবে এই ব্যাপার নিয়ে তাঁর স্ত্রী অনেক অভিমান করেছেন এবং নিধুবাবুও অতি যত্নে তাঁকে পরিতুষ্ট করেছেন। এই সম্বন্ধেও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে।

একবার নিধুবাবু দিন-কয়েক বাড়িতে আসেন নি। ফিরে এলে তাঁর স্ত্রী করুণকণ্ঠে বললেন, 'আমি কুৎসিত তাই কি এমন ঘৃণা করতে হয়?' নিধুবাবু তখন এই বিখ্যাত গানটি রচনা করলেন—

খাম্বাজ—মধ্যমান

তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ ও মহীমণ্ডলে,
আকাশের পূর্ণশশী সেও কাঁদে কলঙ্কছলে।
সৌরভে, গৌরবে (গরবে) কে তব তুলনা হবে
আপনি আপন সম্ভবে
যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে।।

এই গানের একটি পাঠান্তর আছে—

তোমারি তুলনা তুমিই প্রাণ এ মহীমণ্ডলে,
গগনে শরদশশী জিনেছ কলঙ্কছলে
সৌরভে আর গৌরবে কে তব সদৃশ হবে
অন্যের কি সম্ভবে যেমন গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলে।।

সংকলনকর্তারা কোথা থেকে এই পাঠান্তরটি সংগ্রহ করেছেন জানি নে তবে কোনো গায়কের মুখে এই পাঠ শুনি নি। পূর্বোক্ত পাঠটিই শিল্পীসমাজে মুখেমুখে আজ পর্যন্ত চলে আসছে।

আর-একবার তিন দিন শ্রীমতীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করে নিধুবাবু যখন ফিরলেন তখন তাঁর স্ত্রী অভিমানে স্তব্ধ। এই অভিমানকে উপলক্ষ করে তিনি রচনা করলেন—

ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

কেন লো প্রিয়ে কি লাগি মানিনী
ইহার কারণ আমি কিছুই না জানি।

হরি হরি মরি মরি মানভরে ভর করি
নয়ন সহিতে বারি হেরিয়ে ধরণী।
আলুয়ে পড়েছে কেশ বিষাদিনী হীন বেশ
তোমার বিরসশেষ দংশে মোরে ধনি।
মলিন বদনশশী তাহে নাহি হেরি হাসি
চকোর কাতর আসি, ও বিধুবদনি।।

এই প্রসঙ্গেই নিধুবাবু আরো একটি গান রচনা করেন বলে কথিত আছে—

সাহানা—আড়ানা

বিরহ যন্ত্রণা প্রাণ তুমি জানিবে কেমনে
জানিলে আমি কি সদা থাকি হে রোদনে।
নানা স্থানী যেই জন, তার মন কি কখন,
মজে কোন খানে
তারে যেবা দেয় মন সুখী কি কখনে।।

এ দুটি গানই নিঃসন্দেহে নিধুবাবুর রচনা এবং তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত 'গীতরত্ন' গ্রন্থে সংকলিত আছে।

শোনা যায় নিধুবাবু স্ত্রীর পরিতোষের জন্য প্রশ্ন ও উত্তর-ছলে এই দুটি গীত রচনা করেন—

প্রশ্ন :

পাহাড়ি ঝিঁঝিট—জলদ তেতালা

কেতকী এত কি প্রেয়সী তব হে মধুকর
নলিনী নিরাশ্রয়ে দহে নিরন্তর।
নাম তব রসরাজ, রাজার উচিত কাজ
এই কি তোমার
অন্যেরে আপন জ্ঞান আপন অন্তর।।

—'গীতরত্ন'

উত্তর :

পূরবী—আড়াঠেকা

তাই কি মনে করে মানতরে আছ
জ্বালায়ে বিরহানল দহন হতেছ।
প্রণয়ে যতেক হয় সব যদি মনে রয়

তাহলে কি বিচ্ছেদ হয় কার মুখে শুনেছ।

'প্রণয়ে যতেক হয়' এই কথার পরিবর্তে অনেকে 'যে দুঃখ পিরীতি হয়' এই পাঠ ব্যবহার করে থাকেন।

এই উপলক্ষে আরো কয়েকটি সুন্দর গান নিধুবাবুর নামে প্রচলিত আছে। এর মধ্যে একটি গান উদ্ধৃত করি—

খাম্বাজ বাহার—মধ্যমান

কপটে আমারে এত দুখ দেওয়া ভাল নয়,
আগে দুখ দিলে পরে শেষে দুখ পেতে হয়।
(প্রাণে দুখ দিলে পরে মনে দুখ পেতে হয়)।
কথায় কথায় প্রবঞ্চনা ভালবাসা গেছে জানা
যে যাহারে ভালবাসে ব্যাভারে তো জানা যায়।
মুখেতে মধুর হাসি, অন্তরে গরলরাশি
সদা বল ভালবাসি ও-কথা না প্রাণে সয়।।

'বঙ্গীয় সঙ্গীতরত্নমালা'-নামক গ্রন্থ থেকে অমরেন্দ্রনাথ রায় 'নারায়ণ' পত্রিকায় কয়েকটি কাহিনী উদ্ধৃত করেছিলেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে কোনো এক বন্ধু নিধুবাবুকে রহস্য করে বলেন, 'নিধু, প্রেম পিরীতি গেয়ে গেয়েই তো দিন কাটালে—ভাব কিছু বুঝতে পারলে কি?' নিধুবাবু তার উত্তরে এই গানটি রচনা করেন—

খাম্বাজ—মধ্যমান

প্রেম সিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ
রসিকে পার হতে পারে
অরসিকের আতঙ্গ (আতঙ্গ)
চাতুরী তরী একে তাহে কর্ণধার অনঙ্গ
বিচ্ছেদ প্রবল বায়ু কখন করে কি রঙ্গ।।

'প্রেমসঙ্গীত' বইটিতে জানানো হয়েছে যে নিধুবাবু ১২৩০ সালে 'নিধুনিকুঞ্জ' নামে কতকগুলি সংগীত রচনা করেন। কী উপলক্ষে তিনি এগুলি রচনা করেছিলেন এবং রচনাগুলি ছাপা হয়েছিল কিনা তা আমাদের জানা নেই। সন উল্লেখ করাতে মনে হয় এই নামে কোনো বই ছাপা হয়েছিল এবং সনটি ঠিকভাবে উল্লিখিত হয়ে থাকলে বুঝতে হবে যে, মৃত্যুর পনেরো বছর আগে অর্থাৎ প্রায় বিরাশি বছর বয়সে নিধুবাবু এই গানগুলি রচনা করেন। এই রচনাবলীর কিছু 'প্রেমসঙ্গীত' থেকে উদ্ধৃত করা গেল।

সংগীত সংকলনকারীদের মধ্যে অনেকেই এ গানগুলি নিধুবাবুর কিনা নির্ণয় করতে না পেরে রচয়িতার কোনো উল্লেখ করেন নি।

খাম্বাজ—মধ্যমান

তারে হেরিলে নয়ন জুড়ায়
এত যে যাতনা তবু দিতেছ আমায়।
যদি সেই নবঘন নাহি করে বরিষণ
তথাপি চাতকীপ্রাণ সেই দিকে যায়।।

ঝিঁঝিট-কাওয়ালি

সে বিনে যাতনা যত জানাইব কারে
আপন অধিক ভাল সে বাসিত অন্তরে,
সে মোর আঁখির অঞ্জন আমি তার মনোরঞ্জন
করে গেছে বিসর্জন অঞ্জন দিয়ে অন্তরে।।

খাম্বাজ—ঢিমা তিত্রালী

বিধুমুখী একি একি অপরূপ হেরি লো
অধোমুখে কেন আছ মৌনব্রত ধরি লো
কিসে আছ চঞ্চল নিরখিছ ধরাতল
বিধুবদন তোল তোল নইলে প্রাণে মরি লো
অধরসুধা পান বিনে পিপাসায় মরি প্রাণে
বাঁচাও এ অধীনজনে সুদাদান করি লো।।

ভৈরবী—মধ্যমান

সুন্দর হইলে কি হয় বলি প্রাণ তোমায়
রসবোধ না থাকিলে রসবতী কেবা কয়।
চম্পক পুষ্পেরি গন্ধে সবে মত্ত প্রেমানন্দে
তবে কেন সে ফুলেতে ভ্রমর সঞ্চার নয়।
দেখ দেখ প্রাণসখি কোকিল কুৎসিত পাখী
তবে কেন তার রসে সকলে মোহিত হয়।।

ভেব না ভেব না ধনি প্রাণনাথ আসিবে
বিচ্ছেদ যাতনা যাবে মনসাধ পূরিবে।
তোমার বঁধু তোমার হবে মনদুখ নাহি রবে
আবার তুমি মান করিলে পায়ে ধরে সাধিবে।।

এই 'পায়ে ধরে সাধিবে' উক্তিটিতে আর-একটি কাহিনীর কথা মনে পড়ল। কাহিনীটি অমরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে 'বঙ্গীয় সঙ্গীত রত্নমালা' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃত করেছেন। এই গ্রন্থটি আমি খুঁজে পাই নি। অতএব উক্ত প্রবন্ধে যেমন আছে সেইভাবেই বিবৃত করি :

'একদিন নিধুবাবু বাড়িতে বসে মৃদুস্বরে গান করছেন, এমন সময় তাঁর মা এসে প্রশ্ন করলেন 'হ্যাঁরে রাম তুই নাকি বড় গায়ক হয়েছিস? আমরা সেদিন রাজবাড়িতে (শোভাবাজার) কথা শুনতে গিয়েছিলাম, কথকের গান শুনে আপোষের মধ্যে বললাম—'কথকটি বেশ গায়'। একটি সুন্দরী বউ, কাদের জানিনে, যেন ভগবতী, আমার পানে চেয়ে একটু হেসে বল্লে—'আপনি কি আপনার ছেলের গান কখনো শোনেন নি?' আমি বল্লাম—'কই না।' সেই বউটি বল্লে—'তবে একবার শুনবেন।' এমন সময় কথা শেষ হল, আর বউটির পরিচয় নেওয়া হল না। তা বাছা, তুই আজ একটা গান গা আমি শুনি।'

নিধুবাবুর একজন ঠাকরুণ দিদি সেইসময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি রহস্য করে বল্লেন—'দেখ ভাই নাত বউ এর পায়ে ধরার গানটি যেন হয়'।

নিধুবাবু একটু হেসে বল্লেন—'আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য'। তারপরে এই গানটি গাইলেন :

আমি সাধ করে কি ধরি তারই পায়
সে ধন সহজে কি পাওয়া যায়।
সে যে জগদ্‌গুরু কল্পতরু—
মন দিতে হয় যে তারি পায়
সে যে সাধনার ধন অমূল্য রতন
তারে সাধন বিনে কেবা পায়
সে যে অধমতারিণী দুঃখনিস্তারিণী,
তারে প্রেমে বিনা বাঁধা দায়।"

এই গানের রচনাভঙ্গি এবং কাঠামো দেখে কিন্তু নিধুবাবুর লেখা বলে মনে হয় না। তবে এইরকম একটি কাহিনী প্রচলিত আছে বলেই এটির উল্লেখ করা গেল।

নিধুবাবুর অতি দীর্ঘ জীবনের অতি অল্প তথ্যই আমরা জানি। তিনি কোন্ কোন্ ঘটনা অবলম্বনে কোন্ কোন্ গান রচনা করেছিলেন সে-সব খবর আরো কম মেলে। অতএব এই-সব কাহিনী ছাড়া অবলম্বন করার মতো আর কোনো সূত্রই আমাদের নেই এবং এই-সব কাহিনী যে একেবারে মিথ্যা সেটাও জোর করে বলা যায় না, কেননা এগুলি বহুদিন থেকে চলে আসছে। তা ছাড়া উল্লিখিত গানগুলির কাঠামো এবং রচনারীতি লক্ষ্য করলে এগুলি যে নিধুবাবুর রচনা হতে পারে এমন অনুমান করাও অসংগত নয়। এই-সব গানের সঙ্গে নিধুবাবুর নামের যে কাহিনীসূত্রে একটা যোগ রয়েছে, বাংলা গান সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এটাও আমাদের মনে রাখা দরকার। এগুলি হারিয়ে গেলে একটি ক্ষীণসূত্রও হারিয়ে যাবে। এ সম্বন্ধে বহুপূর্বেই বিস্তারিতভাবে অনুসন্ধান করা উচিত ছিল কিন্তু একটা ভ্রমাত্মক নৈতিক মনোভাব এবিষয় থেকে গবেষকদের নিরস্ত করেছে। পাশ্চাত্য দেশ হলে নিধুবাবুর জীবনের এই রোমান্টিক ব্যাপারটি যথেষ্ট কৌতূহল জাগ্রত করত কিন্তু আমাদের শুচিবায়ুগ্রস্ত দেশে এ সম্ভাবনা নেই। আমরা শুচিতা বজায় রেখে পড়ুয়াদের উপযোগী করে ফুটনোট-কণ্টকিত ভারি ভারি গদ্যবন্ধ রচনা করে থাকি, কেননা যে জানালা দিয়ে জীবনের সরস দিকটা দেখা যায় আমাদের প্রচণ্ড নীতিনিষ্ঠা তাকে একেবারে খিল এঁটে বন্ধ করে রাখে।

যাই হোক, নিধুবাবুর স্বভাবে এমন একটা দিক থাকলেও তিনি যথেষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন এটা অবশ্যস্বীকার্য। সংগীত সম্বন্ধে তিনি যে গভীর চিন্তা করেছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। পুরোনো 'দেশ'-এর পাতায় এ বিষয়ে আলোচনা লিপিবদ্ধ আছে। অতএব এ প্রবন্ধে তার আর পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন বোধ করলাম না।